ব্যাখ্যা : ধর্ম নিরপেক্ষতা Secularism

[অনুচ্ছেদ ১২]

ধর্ম নিরপেক্ষতার শাব্দিক অর্থ হল 'ইহজগৎ সম্বন্ধীয়' বা 'ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন-বহির্ভূত'। তবে, সাধারণভাবে, ধর্ম নিরপেক্ষ বা Secular রাষ্ট্র দ্বারা বোঝানো হয় এমন একটি রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থা, যে-রাষ্ট্র বা সমাজ কোনো ধর্মবিশেষের ভিত্তিতে পরিচালিত নয়। এই মতবাদীরা মনে করেন যে, মানবজীবনের পক্ষে যা-কিছুই মঙ্গলজনক, তাই-ই সৎনীতি এবং সৎনীতি ঈশ্বর ও ধর্ম নিরপেক্ষ। ১৮৫১ সালে ইংল্যান্ডের চিন্তাবিদ হোলিওক (G. J. Holyoake) প্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন। তবে এই মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন চার্লস ব্র্যাডলাফ (Charles Bradlaugh)। এই মতবাদ প্রচারের জন্য ইংল্যান্ডে ন্যাশনাল সেক্যুলার সোসাইটি নামে একটি সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে পরিচালিত।

ব্যাখ্যা : সাম্প্রদায়িকতা Communalism

[অনুচ্ছেদ ১২(ক)]

ধর্মীয়, জাতিগত বা আঞ্চলিক সংকীর্ণতাকেই বলে সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতার অপর বৈশিষ্ট্য হলো অন্য ধর্ম, জাতি বা অঞ্চলের ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা–যা প্রায়শই দাঙ্গায় রূপ নেয়। সাম্প্রদায়িকতার উদাহরণ হিসাবে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের মুসলিমবিদ্বেষ, দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাপার্থাইড, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপজাতীয় সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত পৃথিবীর প্রায় দেশেই কোনো-না-কোনো রূপে সাম্প্রদায়িকতার কমবেশি উপস্থিতি রয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতাবাদ এই অনুমানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে অখণ্ড ভারতীয় সমাজ বিভক্ত। এই সম্প্রদায়গুলির স্বার্থ শুধু পৃথক নয়, পরস্পরবিরোধীও বটে। এই বিশ্বাসই সাম্প্রদায়িকতাবাদের সূচনা হয় যে, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে মানুষের ধর্মীয় পরিচয়কে ভিত্তি করে ভারতবাসীকে সংগঠিত ও শ্রেণিবিভক্ত করা যায়। এই বিশ্বাস সাম্প্রদায়িকতাবাদের সূচনাবিন্দু। ধরে নেওয়া হয় যে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পার্থিব স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিপিন চন্দ্রের মতে, ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কালপর্বে এই সাম্প্রদায়িকতাবাদ ভারতে বিদ্যমান ছিল।

মিথ্যা, বিদ্বেষ ও হিংসাকে ভিত্তি করে ১৯৩৭ সালের পর থেকে ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের যে পর্যায় শুরু হয় তাকে বিপিন চন্দ্র উগ্র বা ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িকতাবাদ (extreme or fascist communalism) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই চরমপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের যুক্তি হলো হিন্দু ও মুসলমান

সম্প্রদায়ের স্বার্থ শুধু পৃথকই নয়, তা বৈরিতামূলক এবং তার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। ফলে, এক ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ঘৃণা করার জন্য অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করা হয়। একদিকে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা দাবি করেন যে, ভারত একটি মাত্র জাতির (one nation) দেশ। অন্য দিকে মুসলিম লীগ দ্বিজাতি (two-nation) তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানায়।

সাতচল্লিশে দেশভাগের পরও মুসলিম লীগ, জামায়েতি ইসলামীসহ ধর্মীয় মতাদর্শপুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলো সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ভিত্তিতে দেশ শাসন করেছে। এমনকি এরা অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সচেতনভাবে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও তাদের কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষণ করেছে। বাঙালিরা সবসময় পাকিস্তানী শাসনকাঠামোর গভীরে প্রোথিত এই সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আর্দশের বিরোধীতা করেছে। অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনাসঞ্জাত ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন উদার গণতান্ত্রিকা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম আর্দশ। তবে, স্বাধীন বাংলাদেশের নানা হীন রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক চেতনা লালন পালন করা হয়েছে। বিশেষ করে সামরিক শাসকদের সময়ে তাদের অগণতান্ত্রিক শাসনকে সরলমনা, ধর্মভীরু ও পশ্চাদপদ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ব্যাপকভাবে ধর্মকে ব্যবহার করেছে। এভাবে আমাদের সমাজেও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা মোহাচ্ছন্ন একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

তাই, আজও সাম্প্রদায়িকতাবাদকে এক ভয়ংকর বিপদ হিসেবে গণ্য করা হয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রধানত একটি মতাদর্শ (ideology)। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে মানুষের মন থেকে সাম্প্রদায়িক চিন্তা সমূলে উৎপাটন করা একান্ত প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা : ধর্ম, রাজনীতি ও আইন

Religion, Politics and Law

[অনুচ্ছেদ ১২(গ)]

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তনকালে এর ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার, (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁর উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে।

১৯৭৮ সালের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশদ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয় এবং তা সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনদ্বারা সমর্থিত হয়। সংবিধান প্রবর্তনকালে ৩৮ অনুচ্ছেদে যে-সংগঠনের স্বাধীনতার কথা বলা হয়, সে-সম্পর্কে একটি শর্ত ছিল

যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করার বা তার সদস্য হওয়ার বা অন্য কোনোপ্রকারে তার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকবে না। উক্ত শর্ত ১৯৭৮ সালের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশদ্বারা বিলুপ্ত হয় এবং তা সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনদ্বারা সমর্থিত হয়। অন্যদিকে *১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের* ২০ ধারায় বিধান রয়েছে যে,

১. কোনো ব্যক্তিই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হাসিলের জন্য ধর্মভিত্তিক বা ধর্মের নামে গঠিত কোনো সাম্প্রদায়িক বা অন্য সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন করতে বা এর সদস্য থেকে বা অন্যভাবে এর তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

২. যে-ক্ষেত্রে সরকার সন্তুষ্ট হয় যে, ১ উপধারার বিধান লঙ্ঘন করে সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে, বা সংঘ বা ইউনিয়ন কাজ চালাচ্ছে, সেক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বক্তব্য শ্রবণের পর সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করতে পারেন যে, তেমন সংঘ বা ইউনিয়ন (১) উপধারার বিধান লঙ্ঘন করে গঠন করা হয়েছে বা বিধান লঙ্ঘন করে চালানো হচ্ছে এবং এই ঘোষণার পর সংশ্লিষ্ট সংঘ বা ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেছে বলে গণ্য হবে এবং এর সমস্ত সম্পত্তি ও তহবিল সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে।

৩. উপধারা ২ অনুসারে একটি সংঘ বা ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেওয়ার পর যদি কোনো ব্যক্তি সেই সংঘ বা ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেন বা তেমন সংঘ বা ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করেন বা অন্য কোনোভাবে কাজে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে তিনি তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ১৯ ধারায় ধ্বংসাত্মক সংঘগুলো নিয়ন্ত্রণের যে-বিধান দেওয়া হয়েছে তার ৯ উপধারায় বলা হয়েছে, এই ধারায় বর্ণিত সংঘ ইউনিয়ন বা রাজনৈতিক দলকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

উল্লেখ্য যে, ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনী দ্বারা বাহাত্তরের সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদটি পুনর্বহাল করা হয়েছে। ফলে, বাংলাদেশে এখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় পরিচয় ও অনুভূতির ব্যবহার নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা : বৈষম্য Discrimination

[অনুচ্ছেদ ১২(ঘ), ১৬, ২৮(১), ২৯(২)]

ব্যক্তি বা দলভেদে কোনো নীতির প্রয়োগের ভিন্নতাকে বৈষম্য বলে। অঞ্চল, গোত্র, ধর্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে বিভেদমূলক আচরণ এবং নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য, রাষ্ট্রে ও সমাজে অসন্তোষের জন্ম দিতে পারে।